বানানের নিয়ম ২৭

জাতীয়ভাবে অভিন্ন বাংলা বানান প্রচলিত হওয়া দরকার হলেও উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত বাংলা বানানের সঠিক নিয়ম বলতে তেমন কিছু ছিল না। ১৮০১ সালে খ্রিস্টান পাদ্রীদের উদ্যোগে শ্রীরামপুর মিশনে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলা বানানের রূপ নির্দিষ্ট হয়।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ পর্যন্ত সাহিত্যের নিদর্শন হাতের লেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কবির নিজের হাতের লেখা ছিল দুর্লভ। লিপিকরেরা অনুলিপি তৈরি করতেন। লিপিকরেরা সাধারণত পণ্ডিত ছিলেন না। প্রতিলিপির সময় তাঁরা স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিতেন। ইচ্ছামত কলম চালানোর ফলে একই লিপিকরের প্রতিলিপিতে একই শব্দের নানারকম বানান পাওয়া যেত।

ছাপাখানা চালুর পর সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী বাংলা বানান নির্ধারিত হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বাইরে তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশী, বিদেশী জাতের প্রচুর শব্দ রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে প্রত্যয়, উপসর্গ, সমাস, বিভক্তিযোগে গঠিত নানা মিশ্র শব্দ। চলতি রীতির ব্যাপক সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতেও বানানের পরিবর্তন ঘটছে। ফলে এখন পর্যন্ত বাংলা বানানে সমতাবিধান সম্ভব হয়নি। ছাপার বৈচিত্র্যময় ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কারণে অক্ষরের আকৃতিগত পরিবর্তনও ঘটছে।

বাংলা বানানে সমতা বা অভিন্নতা প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন সময়ে নানারকম প্রচেষ্টা চালানো হলেও এখন পর্যন্ত বানানে বিশৃঙ্খলা দূর করা যায়নি। বানানে ত্রুটির কারণ এমন হতে পারে ঃ

ক. অনুসরণযোগ্য অভিধানের সবগুলোতে একই শব্দের বানানে সমতা নেই বলে লেখক বিভ্রান্ত হন।
খ. লেখকের নিজস্ব বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা ও মতামত বানান রীতি অনুসরণে প্রাধান্য পায়।
গ. অভিধানে একই শব্দের ভিন্ন বানান থাকায় কখনও প্রথমটি, কখনও দ্বিতীয়টি গ্রহণ করা।
ঘ. উচ্চারণের ত্রুটি বা লেখকের বিশেষ উচ্চারণ ভঙ্গির জন্য ভুল শব্দের প্রয়োগ।
ঙ. ছাপার সময় প্রুফ সংশোধনে ত্রুটি।
চ. ভুল বানান জানার জন্য ত্রুটি।

বাংলা বানানের নিয়ম বেঁধে দেওয়ার প্রথম দায়িত্ব পালন করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৩৫ সালে গঠিত বাংলা বানান সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। সামান্য কিছু পরিবর্তনের পর ১৯৩৭ সালে 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই নিয়ম এখন সর্বত্র প্রচারিত এবং এরপরে প্রকাশিত সকল অভিধানে গৃহীত হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নিয়ম বর্তমানে যথাসম্ভব মেনে চলা হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার কমিটি বাংলা বানানের সমস্যাগুলো দেখেছিল এভাবে ঃ

বানান যথাসম্ভব সরল ও উচ্চারণমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু উচ্চারণ বোঝানোর জন্য অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য এবং প্রচলিত রীতি বেশি পরিবর্তন উচিত নয়। অতিরিক্ত অক্ষর বা চিহ্ন চালালে লাভ যত হবে তার চেয়ে লেখক, পাঠক ও মুদ্রাকরের অসুবিধা বেশি হবে। ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ বা শব্দকোষে উচ্চারণ-নির্দেশের জন্য বহু চিহ্নের প্রয়োগ অপরিহার্য,

কিন্তু সাধারণ লেখায় তা ভারস্বরূপ। প্রচলিত শব্দের উচ্চারণ লোকে অর্থ থেকেই বুঝে নেয়। আমাদের ভাষায় বহু শব্দের বানানে ও উচ্চারণে মিল নেই, যেমন ঃ গণ, বন, ঘন ; জলখাবার, জলযোগ ; আষাঢ়, গাঢ় ; সহিত, গলিত ; একদা, একটা। এই প্রকার শব্দের বানান-সংস্কার করতে কেউ চান না, অঞ্চলভেদে উচ্চারণের কিছু পার্থক্য হলেও ক্ষতি হয় না। সুপ্রচলিত শব্দের বানান-সংস্কার যদি করতে হয় তবে, বানানের জটিলতা না বাড়িয়ে সরলতা সম্পাদনের চেষ্টাই কর্তব্য।

অসংখ্য সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ বাংলা ভাষায় অঙ্গীভূত হয়ে আছে। এসব শব্দের বানান সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধানের শাসনে সুনির্দিষ্ট হয়েছে, সেজন্য তাতে হস্তক্ষেপ অবিধেয়।

নবাগত বা অল্প পরিচিত বিদেশী শব্দ সম্বন্ধে বিশেষ বিচার আবশ্যক। এ ধরনের শব্দের বাংলা বানান এখনও সর্বজনগৃহীত রূপে নির্ধারিত হয়নি। তাই সাধারণের যথেচ্ছাচারের ওপর নির্ভর না করে বানানের সরল নিয়ম গঠন করা কর্তব্য।

সমস্ত বাংলা শব্দ এককালে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর নয়। নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ক্রমে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেবল নিয়ম রচনা করে সমস্ত বাংলা শব্দের বানান নির্দেশ অসম্ভব। এর জন্য সঠিক বানানের অভিধান প্রণয়ন করা আবশ্যক।

অভ্যস্ত রীতির পরিবর্তনে অল্পাধিক অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু কেবল সে কারণে নিশ্চেষ্ট থাকলেই কোন বিষয়েই সংস্কার সম্ভব হবে না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত বানান সংস্কার কমিটি আশা করেছিল যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বইপত্রে নিয়মাবলীসম্মত বানান গৃহীত হলে ক্রমে ক্রমে তা সুপ্রচলিত হবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বাংলা বানানের নিয়ম

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ

১। **রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব**—রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না, যথা—'অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কার্তিক, কর্দম, অর্ধ, বার্ধক্য, কর্ম, সর্ব'।

২। **সন্ধিতে ঙ্-স্থানে অনুস্বার**—যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্-স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ্ বিধেয়, যথা— অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, সংখ্যা, সংগম, হৃদয়ংগম, সংঘটন অথবা 'অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর' ইত্যাদি।

অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দ

৩। **রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব**—রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না, যথা—'কর্জ, শর্ত, পর্দা, সর্দার, চর্বি, ফর্মা, জার্মানি'।

৪। **হস্-চিহ্ন**—শব্দের শেষে সাধারণত হস্-চিহ্ন দেওয়া হবে না, যথা—'ওস্তাদ, কংগ্রেস, চেক, জজ, টন, টি-পট, ট্রাম, ডিশ, তছনছ, পকেট, মক্তব, হুক, করিলেন, করিস'। কিন্তু যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হস্-চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে। হ এবং যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সাধারণত স্বরান্ত, যথা—'দহ, অহরহ, কাণ্ড, গঞ্জ'। যদি হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হয় তবে হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের পর হস্-চিহ্ন দেওয়া উচিত, যথা—'শাহ্, তখ্ত, জেম্স্, বন্ড্'। কিন্তু সুপ্রচলিত শব্দে না দিলে চলবে, যথা—'আর্ট, কর্ক, গভর্নমেন্ট, স্পঞ্জ'। মধ্য-বর্ণে প্রয়োজন হলে হস্-চিহ্ন বিধেয়, যথা—'উল্কি, সট্কা'। যদি উপান্ত্য স্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হয় তবে শেষে হস্-চিহ্ন বিধেয়, যথা—'কট্কট্, খপ্, সার্'।

বাংলার কতগুলো শব্দের শেষে অ-কার উচ্চারিত হয়, যথা—গলিত, ঘন, দৃঢ়, প্রিয়, করিয়াছ, করিত, ছিল, এস। কিন্তু অধিকাংশ শব্দের শেষের অ-কার গ্রস্ত অর্থাৎ শেষ অক্ষর হসন্তবৎ, যথা—অচল, গভীর, পাঠ, করুক, করিস, করিলেন। এই প্রকার সুপরিচিত শব্দের শেষে অ-ধ্বনি হবে কি হবে না তা বুঝাবার জন্য কেউই চিহ্ন প্রয়োগ করেন না। অধিকাংশ স্থলে অ-সংস্কৃত শব্দে অন্ত্য হস্-চিহ্ন অনাবশ্যক, বাংলাভাষার প্রকৃতি অনুসারেই হসন্ত-উচ্চারণ হবে। অল্প কয়েকটি বিদেশী

শব্দের শেষে অ উচ্চারণ হয়, যথা—বাই-ল। কিন্তু প্রভেদরক্ষার জন্য অপর বহু বহু শব্দে হস্-চিহ্নের ভার চাপান অনাবশ্যক। কেবল ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকলে হস্-চিহ্ন বিধেয়।

৫। ই ঈ উ ঊ—যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হবে, যথা—কুমীর, পাখী, বাড়ী, শীষ, উনিশ, চূন, পূব অথবা কুমির, পাখি, বাড়ি, শিষ, উনিশ, চুন, পুব। কিন্তু কতগুলো শব্দে কেবল ঈ, কেবল ই অথবা কেবল উ হবে, যথা—নীলা (নীলক), হীরা (হীরক) ; দিয়াশলাই (দীপশলাকা), খিল (কীল), পানি (পানীয়) ; চুল (চুল), তাড়ু (তর্দু), জুয়া (দ্যূত)। [বর্তমানে বাংলা দীর্ঘস্বর বর্জনপূর্বক হ্রস্বস্বর ব্যবহারের প্রবণতা ব্যাপক হয়েছে। অর্থাৎ এ জাতীয় সকল শব্দেই কেবল ি-কার ও উ-কার ব্যবহৃত হচ্ছে।]

স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ বাচক শব্দের অন্তে ঈ হবে, যথা—কলুনী, বাঘিনী, কাবুলী, কেরানী, ঢাকী, ফরিয়াদী, ইংরেজী, বিলাতী, দাগী, রেশমী। কিন্তু কতকগুলো শব্দে ই-কার হবে, যথা—ঝি, দিদি, বিবি; কচি, মিহি, মাঝারি, চল্‌তি। পিসী, মাসী স্থানে বিকল্পে পিসি, মাসি লেখা চলবে। [বর্তমানে এই সকল শব্দে ি-কারই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।]

অন্যত্র মনুষ্যেতর জীব, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্মবাচক শব্দের এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে কেবল ই হবে, যথা—বেঙাচি, বেজি, কাঠি, সুজি, কেরামতি, চুরি, পাগলামি, বাবুগিরি, তাড়াতাড়ি, সরাসরি, সোজাসুজি।

নবাগত বিদেশী শব্দে ঈ উ প্রয়োগ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য।

৬। য য—এই সকল শব্দে য না লিখে জ লেখা বিধেয়, যথা—কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুই, জুত, জো, জোড়, জোড়া, জোত, জোয়াল।

৭। ণ ন—অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল 'ন' হবে, যথা—কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার। কিন্তু যুক্তাক্ষর 'ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ চলবে, যথা—ঘুণ্টি, লুণ্ঠন, ঠাণ্ডা।

'রানী' স্থানে বিকল্পে 'রাণী' চলতে পারবে। [বর্তমানে রানী-শব্দে ণ-এর ব্যবহার আর হয় না বললেই চলে ।]

৮। ও-কার ও ঊর্ধ্ব-কমা প্রভৃতি—সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাবার জন্য অতিরিক্ত ও-কার, ঊর্ধ্ব-কমা বা অন্য চিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়। যদি অর্থগ্রহণে বাধা হয় তবে কয়েকটি শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং আদ্য বা মধ্য অক্ষরে ঊর্ধ্ব-কমা বিকল্পে দেওয়া যেতে পারে, যথা—কাল, কালো; ভাল, ভালো; মত, মতো; পড়ো, প'ড়ো (পড়ুয়া বা পতিত)। [ইংরেজি থেকে ঊর্ধ্ব-কমার ব্যবহার বাঙ্গালায় গৃহীত হয়। কিন্তু ইংরেজির নিয়ম উপেক্ষা করে বাঙ্গালায় এর যথেচ্ছ ও মাত্রাধিক ব্যবহার আরম্ভ হয় এবং এখনও হচ্ছে। ভাষাতত্ত্বগত কোন অক্ষরলুপ্তির ক্ষেত্রে ঊর্ধ্ব-কমার ব্যবহার অবিধেয়,—ইংরেজিতে এরূপ প্রয়োগ বিরল—ইংরেজিতে don (do + on) লেখাই হয়, do'n লেখা হয় না। সুতরাং হ'স, হ'ল, ব'লবে প্রভৃতি শব্দে ঊর্ধ্ব-কমা ব্যবহার না করা উচিত,—অন্যান্য ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব কম ব্যবহার করা ভাল।]

এই সকল বানান বিধেয়—এত, কত, যত, তত; তো, হয়তো; কাল (সময়, কল্য), চাল (চাউল, ছাত, গতি), ডাল (ডাইল, শাখা)।

৯। ং ঙ—'বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন' প্রভৃতি 'বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, ভাঙন' প্রভৃতি উভয় প্রকার বানানই চলবে। হসন্ত ধ্বনি হলে বিকল্পে ং ঙ বিধেয়, যথা—'রং, রঙ ; সং, সঙ ; বাংলা, বাঙলা'। স্বরাশ্রিত হলে ঙ বিধেয়, যথা—'রঙের, বাঙালী, ভাঙন'।

ং ও ঙ-র প্রাচীন উচ্চারণ যাই হউক, আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমান, সেজন্য অনুস্বার স্থানে বিকল্পে ঙ লিখলে আপত্তির কারণ নেই। 'রং-এর' অপেক্ষা 'রঙের' লেখা সহজ। 'রঙ্গের' লিখলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসবে না, কারণ 'রঙ্গ' ও 'রং'-এর উচ্চারণ সমান নয়, কিন্তু 'রং' ও 'রঙ' সমান। [সাধু বা লেখ্য ভাষায় ঙ্গ এবং চলতি বা কথ্য ভাষায় ঙ বা বিকল্পে ং ব্যবহার করা বিধেয়।]

১০। শ ষ স—মূল সংস্কৃত শব্দ-অনুসারে তদ্‌ভব শব্দে শ ষ বা স হবে, যথা—আঁশ (অংশু), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য), মশা (মশক), পিসী (পিতুঃস্বসা)। কিন্তু কতগুলো শব্দে ব্যতিক্রম হবে, যথা—মিন্‌সে (মনুষ্য), সাধ (শ্রদ্ধা)।

বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ-অনুসারে s স্থানে স, sh স্থানে শ হবে, যথা—আসল, ক্লাস, খাস, জিনিস, পুলিস, পেনসিল, মসলা, মাসুল, সবুজ, সাদা, সিমেন্ট, খুশি, চশমা, তক্তাপোশ, পশম, পোশাক, পালিশ, পেনশন, শখ, শৌখিন, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শার্ট, শেক্‌স্‌পিয়র। কিন্তু কতগুলো শব্দে বিকল্পে ব্যতিক্রম হবে, যথা—ইস্তাহার (ইশ্‌তিহার), গোমস্তা (গুমাশতাহ্), ভিস্তি (বিহিশ্‌তী), খ্রীস্ট খ্রিস্ট (Christ)।

শ ষ স এই তিন বর্ণের একটি বা দুটি বর্জন করলে বাংলা উচ্চারণে বাধা হয় না, বরং বানান সরল হয়। কিন্তু অধিকাংশ তদ্‌ভব শব্দে মূল-অনুসারে শ ষ স প্রয়োগ বহুপ্রচলিত, এবং একই শব্দের বিভিন্ন বানান প্রায় দেখা যায় না। এই রীতি সহসা পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। বহু বিদেশী শব্দের প্রচলিত বাংলা বানানে মূল-অনুসারে শ বা স লেখা হয়, কিন্তু কতগুলো শব্দে ব্যতিক্রম বা বিভিন্ন বানানই দেখা যায়—যথা সরবত, শরবত; সরম, শরম; শহর, সহর; শয়তান, সয়তান; পুলিস, পুলিশ। সামঞ্জস্যের জন্য যথাসম্ভব একই নিয়ম গ্রহণীয়।

বিদেশী শব্দের s-ধ্বনির জন্য বাংলায় ছ অক্ষর বর্জনীয়। কিন্তু যেখানে প্রচলিত বাংলা বানানে ছ আছে এবং উচারণেও ছ হয়, সেখানে প্রচলিত বানানই বজায় থাকবে, যথা—কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, পছন্দ।

দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শব্দের প্রচলিত বানান হবে, যথা—করিস, ফরসা (ফরশা), সরেস (সরেশ), উসখুস (উশখুশ)।

১১। ক্রিয়াপদ—সাধু ও চলিত প্রয়োগে কৃদন্ত রূপে 'করান, পাঠান' প্রভৃতি অথবা বিকল্প 'করানো, পাঠানো' প্রভৃতি বিধেয়।

চলিত ভাষার ক্রিয়াপদের বিহিত বানানের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল। বিকল্পে ঊর্ধ্ব-কমা বর্জন করা যেতে পারে এবং -লাম বিভক্তি স্থানে -লুম বা -লেম লেখা যেতে পারে।

হ্-ধাতু—হয়, হন, হও, হস, হই। হচ্ছে। হয়েছে। হক, হন, হও, হ। হল, হলাম। হত। হচ্ছিল। হয়েছিল। হব (হবো), হবে। হয়ো, হস। হতে, হয়ে, হলে, হবার, হওয়া।

খা-ধাতু—খায়, খান, খাও, খাস, খাই। খাচ্ছে। খেয়েছে। থাক, খান, খাও, খা। খেলে, খেলাম। খেত। খাচ্ছিল। খেয়েছিল। খাব (খাবো), খাবে। খেয়ো, খাস। খেতে, খেয়ে, খেলে, খাবার, খাওয়া।

দি-ধাতু—দেয়, দেন, দাও, দিস, দিই। দিচ্ছে। দিয়েছে। দিক, দিন, দাও, দে। দিলে, দিলাম। দিত। দিচ্ছিল। দিয়েছিল। দেব (দেবো), দেবে। দিও, দিস। দিতে, দিয়ে, দিলে, দেবার, দেওয়া।

শু-ধাতু—শোয়, শোন, শোও, শুস, শুই। শুচ্ছে। শুয়েছে। শুক, শুন, শোও, শো। শুল, শুলাম। শুত। শুচ্ছিল। শুয়েছিল। শোব (শোবো), শুয়ো, শুস। শুতে, শুয়ে, শুলে, শোবার, শোয়া।

কর্-ধাতু—করে, করেন, কর, করিস, করি। করছে। করেছে। করুক, করুন, কর্, কর্। করলে, করলাম। করত। করছিল। করেছিল। করব (করবো), করবে। করো, করিস। ক'রতে, ক'রে, ক'রলে, করবার, করা।

কাট্-ধাতু—কাটে, কাটেন, কাট, কাটিস, কাটি। কাটছে। কেটেছে। কাটুক, কাটুন, কাট, কাট্। কাটলে, কাটলাম। কাটত। কাটছিল। কেটেছিল। কাটব (কাটবো), কাটবে। কেটো, কাটিস। কাটতে, কেটে, কাটলে, কাটবার, কাটা।

লিখ্-ধাতু—লেখে, লেখেন, লেখ, লিখিস, লিখি। লিখছে। লিখেছে। লিখুক, লিখুন, লেখ, লেখ্। লিখলে, লিখলাম। লিখত। লিখছিল। লিখেছিল। লিখব (লিখবো), লিখবে। লিখো, লিখিস। লিখতে, লিখে, লিখলে, লেখবার, লেখা।

উঠ্-ধাতু—ওঠে, ওঠেন, ওঠ, উঠিস, উঠি। উঠছে। উঠেছে। উঠুক, উঠুন, ওঠ, ওঠ্। উঠল, উঠলাম। উঠত। উঠছিল। উঠেছিল। উঠব (উঠবো), উঠবে। উঠো, উঠিস। উঠতে, উঠে, উঠলে, ওঠবার, ওঠা।

করা-ধাতু—করায়, করান, করাও, করাস, করাই। করাচ্ছে। করিয়েছে। করাক, করান, করাও, করা। করালে, করলাম। করাত। করাচ্ছিল। করিয়েছিল। করাব (করাবো), করাবে। করিও, করাস। করাতে, করিয়ে, করালে, করাবার, করান (করানো)।

১২। **কতকগুলো সাধুশব্দের চলিত রূপ**—কুয়া, সুতা, মিছা, উঠান, উনান, পুরান, পিছন, পিতল, ভিতর, উপর প্রভৃতি শব্দগুলো সাধুশব্দের মৌখিক রূপ কলকাতা অঞ্চলে অন্যপ্রকার। যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে তার সাধু রূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয়, যথা—পিছন, পিতল, ভিতর, উপর। যার বিকৃতি মধ্য বা শেষ অক্ষরে তার চলিত রূপ মৌখিক রূপের অনুযায়ী করা বিধেয়, যথা—কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উনন, পুরন।

নবাগত ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ

Cut-এর u, cat-এর a এবং f, v, w, z প্রভৃতির প্রতিবর্ণ বাংলায় নেই। অল্প কয়েকটি নতুন অক্ষর বা চিহ্ন বাংলা লিপিতে প্রবর্তিত করলে মোটামুটি কাজ চলতে পারে। বিদেশী শব্দের বাংলা বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত, কিন্তু নতুন অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য বর্জনীয়। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। নবাগত বিদেশী শব্দের শুদ্ধি-রক্ষার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নেই, কাছাকাছি বাংলা রূপ হলেই লেখার কাজ চলবে। যে-সকল বিদেশী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ ও তদনুযায়ী বানান বাংলায় চলে গিয়েছে সে সকল শব্দের প্রচলিত বানানই বজায় থাকবে, যথা—কলেজ, টেবিল, বাইসিকেল, সেকেণ্ড।

১৩। **বিবৃত অ (cut-এর u)**—মূল শব্দে যদি বিবৃত অ থাকে তবে বাংলা বানানে আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়, যথা—ক্লাব (club), বাস্ (bus), বাল্‌ব (bulb), সার্ (sir), থার্ড (third), বাজেট (budget), জার্মান (German), কাটলেট (cutlet), সার্কাস (circus), ফোকাস (focus), রেডিয়ম (radium), ফস্‌ফরস (phosphorus), হিরোডোটস (Herodotus)।

১৪। **বক্র আ (বা বিকৃত এ—cat-এর a)**—মূল শব্দে বক্র আ থাকলে বাংলায় আদিতে 'অ্যা' এবং মধ্যে '্যা' বিধেয়, যথা—অ্যাসিড (acid), হ্যাট (hat)।

এরূপ বানানে '্যা'-কে য-ফলা + আ-কার মনে না করে একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন মনে করা যেতে পারে, যেমন হিন্দিতে এ উদ্দেশ্যে ঐ-কার চলছে (hat)। নাগরি লিপিতে যেমন অ-অক্ষরে ও-কার যোগ করে ও হয়, সেরূপ বাংলায় অ্যা হতে পারে।

১৫। **ঈ ঊ**—মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ ঊ থাকে তবে বাংলা বানানে ঈ ঊ বিধেয়, যথা—সীল (seal), ঈস্ট (east), উস্টার (Worcester), স্পূল্ (spool)।

১৬। **f v**—f ও v স্থানে যথাক্রমে ফ ভ বিধেয়, যথা—ফুট (foot), ভোট (vote)। যদি মূল শব্দে v-এর উচ্চারণ f-এর তুল্য হয়, তবে বাংলা বানানে ফ হবে, যথা—ফন (Von)।

১৭। **w**—w স্থানে প্রচলিত রীতি-অনুসারে উ বা ও বিধেয়, যথা—উইলসন (Wilson), উড (wood), ওয়ে (way)।

১৮। **য়**—নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয়। 'মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম, সোয়েটার' প্রভৃতি বানান চলতে পারে, কারণ য় লিখলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে য়, য়া, য়ো লেখা অনুচিত। 'এডওয়ার্ড ওয়ারবণ্ড' না লিখে 'এড্‌ওআর্ড ওঅরবণ্ড' লেখা উচিত। 'হার্ডওয়ার' (hardware) বানানে দোষ নেই।

১৯। **s, sh**—১০ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

২০। **st**—নবাগত বিদেশী শব্দে st স্থানে নতুন সংযুক্ত বর্ণ স্ট বিধেয়, যথা—স্টোভ (stove)।

২১। **z**—z স্থানে জ বা য় বিধেয়।

২২। **হস্-চিহ্ন**—৪ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত এই বানানের নিয়ম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ অধিকাংশ পণ্ডিত ও লেখক সমর্থন করেন। এখন পর্যন্ত এই নিয়মই আদর্শ নিয়মরূপে মোটামুটি অনুসৃত হচ্ছে।

বাংলা বানানে এতে সম্পূর্ণ সমতা বা অভিন্নতা যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন বলা যায় না। বরং কালে কালে বানানের বিশৃঙ্খলা যেন বেড়ে গেছে। আধুনিককালের দাবি অনুযায়ী নানা বানানের যেসব বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি দেখা যাচ্ছে তার প্রেক্ষিতে বানানের নিয়মকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা দরকার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানে অনেক বিকল্প থাকায় তা সমস্যা হয়ে আছে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর এদেশের সরকার, কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও কোন কোন ব্যক্তি বাংলা বানান ও লিপির সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তা সফল হয়নি।

বাংলা বানান নিয়মিত, অভিন্ন ও প্রমিত করার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড উদ্যোগ গ্রহণ করে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহে একটি অভিন্ন বানান-রীতি অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। কারণ, পাঠ্যপুস্তকে একই শব্দের বানানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ একদিকে শিক্ষার্থীদের যেমন বিভ্রান্ত করে অন্যদিকে তাদের ভাষা শেখার পথেও অন্তরায় সৃষ্টি করে। এদিকে লক্ষ্য রেখে এবং পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৮৪ সালে পাঠ্যপুস্তকে বানানের সমতা বিধানের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। বানানের অভিন্ন রীতি অনুসরণের জন্য এই কমিটি কতিপয় নীতি নির্ধারণ করে দেয়। পরবর্তীকালে বানানের এই নীতিমালা কিছুটা অসম্পূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় বিশেষজ্ঞ-পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের ব্যাপকভিত্তিক মতামত যাচাইয়ের মাধ্যমে একটি অভিন্ন বানান-রীতির সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড একটি জাতীয় কর্মশিবিরের আয়োজন করে। এই কর্মশিবিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক, ভাষা বিশেষজ্ঞ, সৃজনশীল সাহিত্যিক, জাতীয় দৈনিক পত্রিকা সম্পাদক, সাংবাদিক, শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষাক্রম-বিশেষজ্ঞ ও বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষের প্রতিনিধি এবং বাংলা একাডেমী, ইসলামী ফাউণ্ডেশন ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড-এর প্রতিনিধিরা অংশ নেন। প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে অনুসরণের জন্য তাঁরা এই কর্মশিবিরে অভিন্ন বানান-রীতির কতিপয় সুপারিশ প্রণয়ন করেন এবং তা চূড়ান্তভাবে এই কর্মশিবিরে গৃহীত হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহে বর্তমানে এই বানান-রীতিই অনুসৃত হচ্ছে। বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তকসমূহেও এ বানান-রীতি অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বানানরীতি

১.০০ পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের জন্য নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করা হবে ঃ

১.০১ রেফের পর কোথাও ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন—কর্ম, কার্য, শর্ত, সূর্য।

১.০২ সন্ধিতে প্রথম পদের শেষে ম্ থাকলে ক-বর্গের পূর্বে ম্ স্থানে ং লেখা হবে। যেমন, অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত। অন্যান্য ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ এবং ক্ষ-র পূর্বে নাসিক্যবর্ণ যুক্ত করার জন্য সর্বত্র ঙ লেখা হবে। যেমন, অঙ্ক, আকাঙ্ক্ষা, সঙ্গে। প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে অনুস্বার ব্যবহৃত হবে। যেমন, রং। তবে শব্দে অব্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরবর্ণ থাকলে ঙ হবে। যেমন, বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের।

১.০৩ হস্‌চিহ্ন ও ঊর্ধ্বকমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন, করব, চট, দু জন।

১.০৪ যে শব্দের বানানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় স্বর অভিধানসিদ্ধ, সেক্ষেত্রে এবং অ-তৎসম ও বিদেশী শব্দের বানানে শুধু হ্রস্ব স্বর প্রযুক্ত হবে। যেমন, পাখি, বাড়ি, হাতি।

১.০৫ ক্ষ-বিশিষ্ট সকল শব্দে ক্ষ অক্ষুণ্ন থাকবে। যেমন, অক্ষয়, ক্ষেত, পক্ষ।

১.০৬ কয়েকটি স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার হবে। যেমন, গাভী, রানী, হরিণী; কিঙ্করী, পিশাচী, মানবী।

১.০৭ ভাষা ও জাতির নামের শেষে ই-কার থাকবে। যেমন, ইংরেজি, জাপানি, বাঙালি।

১.০৮ বিশেষণবাচক 'আলি'-প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন, বর্ণালি, রূপালি, সোনালি।

১.০৯ পদাশ্রিত নির্দেশক 'টি'-তে ই-কার হবে। যেমন, লোকটি।

১.১০ অর্থভেদ বোঝাবার জন্য প্রয়োজন-অনুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর ব্যবহার করা হবে। যেমন, কি (অব্যয়) ঃ কী (সর্বনাম), তৈরি (ক্রিয়া) ঃ তৈরী (বিশেষণ), নিচ (নিম্ন অর্থে) ঃ নীচ (হীন অর্থে), কুল (বংশ অর্থে) ঃ কূল (তীর অর্থে)।

১.১১ বাংলায় প্রচলিত কৃতঋণ বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতিতে লিখিত হবে। যেমন, কাগজ, জাহাজ, হাসপাতাল। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে ঃ

(ক) ইসলাম ধর্ম-সম্পর্কিত নিম্নলিখিত শব্দে ض (যোয়াদ) ও ذ (যাল)-এর জন্য য (ইংরেজি z ধ্বনির মত) ব্যবহৃত হবে। যেমন, আযান, এযিন, ওযু, কাযা, নামায, মুযাযযিন, যাকাত, যিকির, যোহর, রমযান, হযরত।

(খ) অনুরূপ শব্দে আরবি ص (সোয়াদ) ও س (সিন)-এর জন্য স এবং ش (শিন)-এর জন্য শ হবে। যেমন, সালাম, মসজিদ, সালাত, এশা।

(গ) ইংরেজি এবং ইংরেজির মাধ্যমে আগত s ধ্বনির জন্য স ও sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি ধ্বনির জন্য শ এবং st ধ্বনির জন্য স্ট যুক্তবর্ণ লেখা হবে।

(ঘ) ইংরেজি বক্র a ধ্বনির জন্য শব্দের প্রারম্ভে এ ব্যবহার্য। যেমন, এলকহল, এসিড।

(ঙ) Christ ও Christian শব্দের বাংলা রূপ হবে খ্রিস্ট ও খ্রিস্টান। এই নিয়মে খ্রিস্টাব্দ হবে।

১.১২ পূর্ববর্তী নিয়মের (ক) থেকে (ঘ) পর্যন্ত বর্ণিত বিধি ব্যতিক্রম বলে গণ্য হবে। তা ছাড়াও সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে ণত্ব-ষত্ব বিধি অনুসরণ করা হবে না। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, নাসিক্যধ্বনি যুক্ত করার জন্য চ-বর্গের পূর্বে কেবল ঞ (যেমন, অঞ্চল, অঞ্জলি, বাঞ্ছা), ট-বর্গের পূর্বে কেবল ণ (যেমন, কাণ্ড, ঘণ্টা) এবং ত-বর্গের পূর্বে কেবল ন (যেমন, তন্তু, পান্থ) লেখা হবে। অনুরূপভাবে, শিসধ্বনি যুক্ত করার জন্য চ-বর্গের অঘোষধ্বনির পূর্বে কেবল শ (যেমন, নিশ্চয়, নিশ্ছিদ্র), ট-বর্গের অঘোষধ্বনির পূর্বে কেবল ষ (যেমন, কষ্ট, কাষ্ঠ) এবং ত-বর্গের অঘোষধ্বনির পূর্বে কেবল স (যেমন, অস্ত, আস্থা) ব্যবহৃত হবে।

১.১৩ পদান্তে বিসর্গ থাকবে না। যেমন, ক্রমশ, প্রধানত, মূলত।

১.১৪ ক্রিয়াপদের বানানে পদান্তে ও-কার অপরিহার্য নয়। যেমন, করব, হল ইত্যাদি। এত, মত, কোন প্রভৃতি শব্দে ও-কার আবশ্যক নয়। তবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ও-কার রাখা যাবে। যেমন, করো, কোরো, বলো, বোলো।

১.১৫ ব্যঞ্জনবর্ণে উ-কার (ু), ঊ-কার (ূ) ও ঋ-কারের (ৃ) একাধিক রূপ পরিহার করে এই কারগুলো বর্ণের নিচে যুক্ত করা হবে। যেমন, শুভ, রূপ, হৃদয়।

১.১৬ যুক্তব্যঞ্জন স্বচ্ছ করার জন্য প্রথম বর্ণের রূপ ক্ষুদ্রাকারে এবং দ্বিতীয় বর্ণের রূপ পূর্ণরূপে লিখিত হবে। যেমন, অঙ্ক, সঙ্গে, স্পষ্ট।

১.১৭ যেসব যুক্তব্যঞ্জন বাংলা উচ্চারণে নতুন ধ্বনি গ্রহণ করে—যেমন, ক্ষ (ক্ + ষ), জ্ঞ (জ্ + ঞ), হ্ম বা হ্ম (হ্ + ম), সেগুলোর রূপ অক্ষুণ্ন থাকবে। তাছাড়া নন্দনতাত্ত্বিক বিচাবে ঞ্চ (ঞ্ + চ), ঞ্ছ (ঞ্ + ছ), ঞ্জ (ঞ্ + জ), ট্ট (ট্ + ট), ট্র (ট্ + র), ত্ত (ত্ + ত), ত্থ (ত্ + থ), ত্র (ত্ + র), ভ্র (ভ্ + ব), হ্ণ (হ্ + ণ), হ্ন (হ্ + ন), ষ্ণ (ষ্ + ণ) ইত্যাদি যুক্তবর্ণের প্রচলিত রূপও অক্ষুণ্ন রাখা হবে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে যুক্ত ব্যঞ্জন গঠনের রূপ ব্যাখ্যা করা হবে।

১.১৮ সমাসবদ্ধ পদ একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন, জটিলতামূলক, বিজ্ঞানসম্মত, সংবাদপত্র। অর্থগতভাবে একক হলেও তা একসঙ্গে লেখা হবে। যেমন, ষোলকলা। প্রয়োজনবোধে শব্দের মাঝখানে হাইফেন দেওয়া যেতে পারে। যেমন, কিছু-না-কিছু, লজ্জা-শরম, সংগত-পাঠ-নির্ধারণ।

১.১৯ বিশেষণবাচক পদ (গুণ, সংখ্যা বা দূরত্ব ইত্যাদি-বাচক) হলে সেটি আলাদা বসবে। যেমন, এক জন, কত দূর, সুন্দর ছেলে।

১.২০ নঞর্থক শব্দ পৃথকভাবে বসবে। যেমন, ভয়ে নয়, হয় না, আসে নি, হাতে নেই।

১.২১ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নামের সঙ্গে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে (স), অন্য নবী ও রসূলের নামের পরে বন্ধনীব মধ্যে (আ), সাহাবীদের নামের পরে (রা) এবং বিশিষ্ট মুসলিম ধার্মিক ব্যক্তির নামের পরে (র) লিখতে হবে।

১.২২ লেখক ও কবি নিজেদের নামের বানান যেভাবে লেখেন বা লিখতেন, সেভাবে লেখা হবে।

১.২৩ বাংলাদেশের টাকার প্রতীকচিহ্নের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য অঙ্কের বইতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বইতে তার মূল্য-নির্দেশক সংখ্যার পূর্বে টাকার চিহ্ন ব্যবহার করা হবে।

১.২৪ পূর্ববর্ণিত নিয়মাবলীর বহির্ভূত শব্দের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অভিধানগুলোতে প্রদত্ত প্রথম বানান গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

চলন্তিকা ঃ রাজশেখর বসু।

ব্যবহারিক শব্দকোষ ঃ কাজী আবদুল ওদুদ।

বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, দু খণ্ড ঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সঙ্কলন ঃ হরেন্দ্রচন্দ্র পাল।

পারসো-এরাবিক এলিমেন্টস ইন বেঙ্গলি ঃ গোলাম মকসুদ হিলালী।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের এই বানানের নিয়ম বোর্ডের নিজস্ব প্রকাশনার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়। বোর্ড অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকে এই বানান পদ্ধতি অনুসরণের নির্দেশ থাকলেও তা যথাযথ পালন করা হয় বলে মনে হয় না। তাছাড়া বোর্ডের প্রকাশিত বইয়ের বাইরে প্রকাশক, সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্যরা এই নিয়ম অনুসরণ করেন না বলে বানানে সমতা বিধান সর্বত্র সাধিত হয়নি।

বাংলা একাডেমী সম্প্রতি (ডিসেম্বব, ১৯৯২) বাংলা বানানকে নিয়মিত, অভিন্ন ও প্রমিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে একটি নিয়ম দাঁড় করিয়েছে। এখন থেকে বাংলা একাডেমী তার সকল কাজে, তার বই ও পত্রপত্রিকায় এই বানান ব্যবহার করবে। ভাষা ও সাহিত্যের জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে বাংলা একাডেমী সংশ্লিষ্ট সকলকে—লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী এবং বিশেষভাবে সংবাদপত্রগুলোকে, সরকারী ও বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানকে—এই বানান ব্যবহারের সুপারিশ ও অনুরোধ করেছে।

বাংলা একাডেমীর প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

তৎসম শব্দ

১.০১. তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। কারণ এসব শব্দের বানান ও ব্যাকরণগত প্রকরণ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট রয়েছে।

১.০২. তবে যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার -কারচিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে। যেমন—কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধমনি, ধূলি, পঞ্জি, পদবি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, লহরি, সরণি, সূচিপত্র, উর্ণা, উষা।

১.০৩. রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন—অর্চনা, অর্জন, অর্থ, অর্ধ, কর্দম, কর্তন, কর্ম, কার্য, গর্জন, মূর্ছা, কার্তিক, বার্ধক্য, বার্তা, সূর্য।

১.০৪. ক খ গ ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন—অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন। বিকল্পে ঙ্ লেখা যাবে। ক্ষ-এর পূর্বে সর্বত্র ঙ্ হবে। যেমন—আকাঙ্ক্ষা।

অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্‌ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দ

২.০১. ই ঈ উ ঊ

সকল অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্‌ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের -কার চিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে। এমনকি স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন গাড়ি, চুরি, দাড়ি, বাড়ি, ভারি, শাড়ি, তরকারি, বোমাবাজি, দাবি, হাতি, বেশি, খুশি, হিজরি, আরবি, ফারসি, ফরাসি, বাঙালি, ইংরেজি, জাপানি, জার্মানি, ইরানি, হিন্দি, সিন্ধি, ফিরিঙ্গি, সিঙ্গি, ছুরি, টুপি, সরকারি, মালি, পাগলামি, পাগলি, দিঘি, কেরামতি, বেশমি, পশমি, পাখি, ফরিয়াদি, আসামি, বে-আইনি, ছড়ি, কুমির, নানি, দাদি, বিবি, মামি, চাচি, মাসি, পিসি, দিদি, বুড়ি, ছুঁড়ি, নিচে, নিচু, ইমান, চুন, পুব, ভুখা, মুলা, পুজো, উনিশ, উনচল্লিশ।

অনুরূপভাবে -আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কাব হবে। যেমন—খেয়ালি, বর্ণালি, মিতালি, সোনালি, হেঁয়ালি।

তবে কোন কোন স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার দেওয়া যেতে পারে। যেমন—রানী, পরী, গাভী।

সর্বনাম পদরূপে এবং বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন—কী করছ ? কী পড়ো ? কী খেলে ? কী আর বলব ? কী জানি ? কী যে করি ! তোমার কী ? এটা কী বই ? কী করে যাব ? কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে। কী আনন্দ ! কী দুরাশা !

অন্য ক্ষেত্রে অব্যয় পদরূপে ই-কার দিয়ে কি শব্দটি লেখা হবে। যেমন—তুমিও কি যাবে ? সে কি এসেছিল ? কি বাংলা কি ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী।

পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন—ছেলেটি, লোকটি, বইটি।

২.০২. ক্ষ

ক্ষীব, ক্ষুর ও ক্ষেত শব্দ খির, খুর ও খেত না লিখে সংস্কৃত মূল অনুসরণে ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত-ই লেখা হবে। তবে অ-তৎসম শব্দ খুদ, খুদে, খুর, খেপা, খিধে ইত্যাদি লেখা হবে।

২.০৩. মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন

তৎসম শব্দের বানানে ণ, ন-য়ের নিয়ম ও শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে। এছাড়া তদ্‌ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র কোন শব্দের বানানে ণত্ব-বিধি মানা হবে না অর্থাৎ ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন—অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, সোনা, হর্ন।

তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের পূর্বে ণ হয়, যেমন—কণ্টক, লুণ্ঠন, প্রচণ্ড। কিন্তু তৎসম ছাড়া অন্য সকল শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-য়ের আগেও কেবল ন হবে। অ-তৎসম শব্দে যুক্তাক্ষরের বানানের জন্য ৪.০১ দ্রষ্টব্য।

২.০৪. শ, ষ, স,

তৎসম শব্দের বানানে শ, ষ, স-য়ের নিয়ম মানতে হবে। এছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে সংস্কৃতের ষত্ব-বিধি প্রযোজ্য হবে না।

বিদেশী মূল শব্দে শ, স-য়ের যে প্রতিষঙ্গী বর্ণ বা ধ্বনি রয়েছে বাংলা বানানে তাই ব্যবহার করতে হবে। যেমন ঃ সাল (বৎসর), সন, হিসাব, শহর, শরবত, শামিয়ানা, শখ, শৌখিন, মসলা, জিনিস, আপস, সাদা, পোশাক, বেহেশ্‌ত, নাশতা, কিশমিশ, শরম, শয়তান, শার্ট, স্মার্ট। তবে পুলিশ শব্দটি ব্যতিক্রমরূপে শ দিয়ে লেখা হবে। তৎসম শব্দে ট, ঠ বর্ণের পূর্বে ষ হয়। যেমন—বৃষ্টি, দুষ্ট, নিষ্ঠা, পৃষ্ঠা। কিন্তু বিদেশী শব্দে এই ক্ষেত্রে স হবে। যেমন—স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্টুডিয়ো, স্টেশন, স্টোর, স্ট্রিট।

২.০৫. আরবি-ফারসি শব্দে 'সে' ث, 'সিন্' س, 'সোয়াদ' ص বর্ণগুলির প্রতিবর্ণরূপে স এবং 'শিন্' ش -এর প্রতিবর্ণ-রূপে শ ব্যবহৃত হবে। যেমন ঃ সালাম, তসলিম, ইসলাম, মুসলিম, মুসলমান, সালাত, এশা, শাবান (হিজরি মাস), শাওয়াল (হিজরি মাস), বেহেশ্‌ত।

এই ক্ষেত্রে স-এর পরিবর্তে ছ লেখার কিছু কিছু প্রবণতা দেখা যায়, তা ঠিক নয়। তবে যেখানে বাংলা বিদেশী শব্দের বানান সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে স ছ-য়ের রূপ লাভ করেছে সেখানে ছ ব্যবহার করতে হবে। যেমন—পছন্দ, মিছিল, মিছরি, তছনছ।

২.০৬. ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশী s বর্ণ বা ধ্বনির জন্য স এবং sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। তবে question ইত্যাদি শব্দের বানান অন্যরূপ, যেমন—কোএস্‌চ্‌ন হতে পারে।

২.০৭. জ, য

বাংলায় প্রচলিত বিদেশী শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি-অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন—কাগজ, জাহাজ, হুকুম, হাসপাতাল, টেবিল, পুলিশ, ফিরিস্তি, হাজার, বাজার, জুলুম, জেব্রা।

কিন্তু ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ শব্দে 'যে' ز , 'যাল' ذ , 'যোয়াদ' ض , 'যোই' ظ রয়েছে, যার ধ্বনি ইংরেজি z-এর মত, সেক্ষেত্রে উক্ত আরবি বর্ণগুলোর জন্য য ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন—আযান, এযিন, ওযু, কাযা, নামায, মুয়ায্‌যিন, যোহর, রমযান। তবে কেউ ইচ্ছা করলে এই ক্ষেত্রে য-এর পরিবর্তে জ ব্যবহার করতে পারেন।

জাদু, জোয়াল, জো ইত্যাদি শব্দ জ দিয়ে লেখা বাঞ্ছনীয়।

২.০৮. এ, অ্যা

বাংলায় এ বা ে-কার দ্বারা অবিকৃত এ এবং বিকৃত বা বাঁকা অ্যা এই উভয় উচ্চারণ বা ধ্বনি নিষ্পন্ন হয়। তৎসম বা সংস্কৃত ব্যাস, ব্যায়াম, ব্যাহত, ব্যাপ্ত, জ্যামিতি ইত্যাদি শব্দের বানান অনুরূপভাবে লেখার নিয়ম রয়েছে। অনুরূপ তৎসম এবং বিদেশী শব্দ ছাড়া অন্য সকল বানানে অবিকৃত-বিকৃত নির্বিশেষে এ বা ে-কার হবে। যেমন—দেখে, দেখি, যেন, জেনো, কেন, কেনো (ক্রয় করো), গেল, গেলে, গেছে।

বিদেশী শব্দে অবিকৃত উচ্চারণের ক্ষেত্রে এ বা ে-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন—এন্ড, নেট, বেড, শেড।

বিদেশী শব্দে বিকৃত বা বাঁকা উচ্চারণে অ্যা বা ্যা ব্যবহৃত হবে। যেমন—অ্যাণ্ড, অ্যাবসার্ড, অ্যাসিড, ক্যাসেট, ব্যাক, ম্যানেজার, হ্যাট।

তবে কিছু তদ্‌ভব এবং বিশেষভাবে দেশী শব্দ রয়েছে যার ্যা-কারযুক্ত রূপ বহুল-পরিচিত। যেমন—ব্যাঙ, চ্যাঙ, ল্যাঙ, ল্যাঠা। এসব শব্দে ্যা অপরিবর্তিত থাকবে।

২.০৯. ও

বাংলায় অ-কারের উচ্চারণ বহুক্ষেত্রে ও-কার হয়। এই উচ্চারণকে লিখিত রূপ দেওয়ার জন্য ক্রিয়াপদের বেশ কয়েকটি রূপের এবং কিছু বিশেষণ ও অব্যয় পদের শেষে, কখন আদিতে অনেকে যথেচ্ছভাবে ো-কার ব্যবহার করছেন। যেমন—ছিলো, করলো, বলতো, কোরছে, হোলে, যেনো, কেনো (কীজন্য) ইত্যাদি ও-কারযুক্ত বানান লেখা হচ্ছে। বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া অনুরূপ ো-কার ব্যবহার করা হবে না। বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে এমন অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদ এবং বিশেষণ ও অব্যয় পদ বা অন্য শব্দ যার শেষে ো-কার যুক্ত না করলে অর্থ অনুধাবনে ভ্রান্তি বা বিলম্ব ঘটতে পারে। যেমন—ধরো, চড়ো, বলো, বোলো, জেনো, কেনো (ক্রয় করো), করানো, খাওয়ানো, শেখানো, করাতো, মতো, ভালো, আলো, কালো, হলো।

২.১০. ং, ঙ

তৎসম শব্দে ং এবং ঙ যেখানে যেমন ব্যবহার্য ও ব্যাকরণসম্মত সেভাবে ব্যবহার করতে হবে। এ সম্পর্কে পূর্বে ১.০৪ অনুচ্ছেদে কিছু নিয়মের কথা বলা হয়েছে। তদ্‌ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দের বানানের ক্ষেত্রে ওই নিয়মের বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এই ক্ষেত্রে প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন—রং, সং, পালং, ঢং, রাং, গাং। তবে শব্দে অব্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরচিহ্ন থাকলে ঙ হবে। যেমন—বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের। বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দ দুটি ং দিয়ে লিখতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানে তাই করা হয়েছে।

২.১১. রেফ (র্) ও দ্বিত্ব

তৎসম শব্দের অনুরূপ বানানের ক্ষেত্রে যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, অ-তৎসম সকল শব্দেও রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন—কর্জ, কোর্তা, মর্দ, সর্দার।

২.১২. বিসর্গ

শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন—কার্যত, মূলত, প্রধানত, প্রয়াত, বস্তুত, ক্রমশ, প্রায়শ।

পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে। তবে অভিধানসিদ্ধ হলে পদমধ্যস্থ বিসর্গ বর্জনীয়। যেমন—দুস্থ, নিস্পৃহ।

২.১৩. -আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দ

-আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ো-কার যুক্ত করা হবে। যেমন—করানো, বলানো, খাওয়ানো, পাঠানো, নামানো, শোয়ানো।

২.১৪. বিদেশী শব্দ ও যুক্তবর্ণ

বাংলায় বিদেশী শব্দের বানানে যুক্তবর্ণকে বিশ্লিষ্ট করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যুক্তবর্ণের সুবিধা হচ্ছে তা উচ্চারণের দ্বিধা দূর করে। তাই ব্যাপকভাবে বিদেশী শব্দের বানানে যুক্তবর্ণ বিশ্লিষ্ট করা অর্থাৎ ভেঙে দেওয়া উচিত নয়। শব্দের আদিতে তো অনুরূপ বিশ্লেষ সম্ভবই নয়। যেমন—স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং। তবে কিছু কিছু বিশ্লেষ করা যায়। যেমন—সেপটেম্বর, অকটোবর, মার্ক্স, শেক্স্পিয়র, ইস্রাফিল।

২.১৫. হস্-চিহ্ন

হস্চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন—কাত, মদ, চট, ফটফট, কলকল, ঝরঝর, তছনছ, জজ, টন, হুক, চেক, ডিশ, করলেন, বললেন, শখ, টাক, টক।

তবে যদি ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হস্-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন—উহ্, যাহ্।

যদি অর্থের বিভ্রান্তির আশঙ্কা থাকে তাহলেও তুচ্ছ অনুজ্ঞায় হস্-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন—কর্, ধর্, মর্, বল্।

২.১৬. ঊর্ধ্ব-কমা

ঊর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন—করল (= করিল), ধরত, বলে (= বলিয়া), হয়ে, দু জন, চার শ, চাল (= চাউল), আল (= আইল্)।

৩.০১. যুক্ত-ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যতদূর সম্ভব স্বচ্ছ করতে হবে অর্থাৎ পুরাতন রূপ বাদ দিয়ে এগুলির স্পষ্ট রূপ দিতে হবে। তার জন্য কতকগুলি স্বরচিহ্নকে বর্ণের নিচে বসাতে হবে। যেমন—গু, রু, শু, দ্রু, শ্রু, রূ, ভ্রূ, হূ, হৃ, ত্র, ভ্র।

তবে ক্ষ-এর পরিচিত যুক্ত-রূপ অপরিবর্তিত থাকবে।

৩.০২. সমাসবদ্ধ পদগুলি একসঙ্গে লিখতে হবে, মাঝখানে ফাঁক রাখা চলবে না। যেমন—সংবাদপত্র, অনাস্বাদিতপূর্ব, পূর্বপরিচিত, রবিবার, মঙ্গলবার, স্বভাবগতভাবে, লক্ষ্যভ্রষ্ট, বারবার, বিষাদমণ্ডিত, সমস্যাপূর্ণ, অদৃষ্টপূর্ব, দৃঢ়সঙ্কল্প, সংযতবাক, নেশাগ্রস্ত, পিতাপুত্র।

বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ পদটিকে একটি, কখনো একটির-বেশি হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায়। যেমন—মা-মেয়ে, মা-ছেলে, বেটা-বেটি, বাপ-বেটা, ভবিষ্য-তহবিল, সর্ব-অঙ্গ, বে-সামরিক, স্থল-জল-আকাশ-যুদ্ধ, কিছু-না-কিছু।

৩.০৩. বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন—সুনীল আকাশ, তব্ধ মধ্যাহ্ন, সুগন্ধ ফুল, লাল গোলাপ, ভালো দিন, সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু যদি সমাসবদ্ধ পদ অন্য বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদের গুণ বর্ণনা করে তাহলে স্বভাবতই সেই যুক্তপদ একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন—কতদূর যাবে, একজন অতিথি, তিনহাজার টাকা, বেশির-ভাগ ছেলে, শ্যামলা-বরন মেয়ে। তবে কোথাও কোথাও সংখ্যাবাচক শব্দ একসঙ্গে লেখা যাবে। যেমন—দুজনা।

৩.০৪. নাই, নেই, না, নি এই নঞর্থক অব্যয় পদগুলি শব্দের শেষে যুক্ত না হয়ে পৃথক থাকবে। যেমন—বলে নাই, যাই নি, পাব না, তার মা নাই, আমার ভয় নেই।

তবে শব্দের পূর্বে নঞর্থক উপসর্গরূপে না উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যেমন—নারাজ, নাবালক, নাহক।

অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভূত হলে না-এর পর হাইফেন ব্যবহার করা যায়। যেমন—না-বলা বাণী, না-শোনা কথা, না-গোনা পাখি।

৩.০৫. উদ্ধৃতি মূলে যেমন আছে ঠিক তেমনি লিখতে হবে। কোনো পুরাতন রচনায় যদি বানান বর্তমান নিয়মের অনুরূপ না হয়, উক্ত রচনার বানানই যথাযথভাবে উদ্ধৃত করতে হবে। যদি উদ্ধৃত রচনায় বানানেব ভুল বা মুদ্রণের ত্রুটি থাকে, ভুলই উদ্ধৃত করে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে শুদ্ধ বানানটির উল্লেখ করতে হবে। এক বা দুই ঊর্ধ্ব-কমার দ্বারা উদ্ধৃত অংশকে চিহ্নিত করতে হবে। তবে উদ্ধৃত অংশকে যদি ইনসেট করা হয় তাহলে ঊর্ধ্ব-কমার চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে না। তাছাড়া কবিতা যদি মূল চরণ-বিন্যাস অনুযায়ী উদ্ধৃত হয় এবং কবির নামের উল্লেখ থাকে সেক্ষেত্রেও উদ্ধৃতি-চিহ্ন দেয়ার দরকার নেই। ইনসেট না হলে গদ্যের উদ্ধৃতিতে প্রথমে ও শেষে উদ্ধৃতি-চিহ্ন দেয়া ছাড়াও প্রত্যেক অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে উদ্ধৃতি-চিহ্ন দিতে হবে। প্রথমে, মধ্যে বা শেষে উদ্ধৃত রচনার কোনো অংশ যদি বাদ দেয়া হয় অর্থাৎ উদ্ধৃত করা না হয়, বাদ দেয়ার স্থানগুলিকে তিনটি বিন্দু বা ডট্ (অবলোপ-চিহ্ন) দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে। গোটা অনুচ্ছেদ, স্তবক বা একাধিক ছত্রের কোনো বৃহৎ অংশ বাদ দেয়ার ক্ষেত্রে তিনটি তারকার দ্বারা একটি ছত্র রচনা করে ফাঁকগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে।

কোনো পুরাতন রচনার অভিযোজিত বা সংক্ষেপিত পাঠে অবশ্য পুরাতন বানানকে বর্তমান নিয়ম-অনুযায়ী পরিবর্তিত করা যেতে পারে।

৪.০১. ণত্ব-বিধি সম্পর্কে দুই মত

অ-তৎসম শব্দের যুক্তাক্ষরের বানানের ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যগণ একমত হতে পারেনি। একটি মতে বলা হয়েছে যে, এসব শব্দে যুক্তাক্ষরে ণ্ট ণ্ঠ ণ্ড ণ্ঢ হবে। যথা—ঘণ্টা, লণ্ঠন, গুণ্ডা। অন্যমতে, বলা হয়েছে যে, এসব শব্দের যুক্তাক্ষরে ন্ট, ন্ঠ, ন্ড, ন্ঢ ব্যবহৃত হবে। যথা—ঘন্টা, প্যান্ট, প্রেসিডেন্ট, লন্ঠন, গুন্ডা, পান্ডা, লন্ডভন্ড।

বাংলাদেশে বানানের সমতা বিধানের চেষ্টার বাইরে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা বানানের কিছু সংস্কার সাধিত হয়েছে। আমাদের বানানের ওপর তারও প্রভাব পড়ছে। বানানের নিয়মে সমতা আনয়নের জন্য এসব উদ্যোগ সমন্বিত না হওয়ায় আমাদের বানানে এখনও যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা রয়ে গেছে। কোন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে তার কোন বাধ্যবাধকতা না থাকায় এই সমস্যা এখনও বর্তমান। এ ব্যাপারে একটি সর্বজনগ্রাহ্য নিয়ম তৈরি করা এবং তা অনুসরণে দেশের সবাইকে বাধ্য করার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক।

প্রতিবর্ণীকরণ সম্পর্কে আরও কিছু কথা ঃ

প্রতিবর্ণীকরণ ঃ এক ভাষার ধ্বনিকে অন্য কোন ভাষার বর্ণমালার বর্ণে লেখার নাম **প্রতিবর্ণীকরণ**। যেমন ঃ লণ্ডন, রেস্তরাঁ, বায়তুল মুকাররম যথাক্রমে ইংরেজি, ফরাসি ও আরবি শব্দের প্রতিবর্ণীকৃত রূপ। এইরকম আব্রাহাম লিঙ্কন, ম্যাক্সিম গোর্কি, ওয়র অ্যাণ্ড পিস, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, বাস্কেটবল, নিউ মার্কেট প্রভৃতি। বাংলা বর্ণে অন্য ভাষার শব্দ যা-ই লেখা হয়, তা-ই প্রতিবর্ণীকরণের উদাহরণ। সব ভাষার ধ্বনিসম্ভার একরকম নয়। প্রতিবর্ণীকরণ কখনই যথাযথ হয় না। বাংলায় অনেক শব্দ আছে যা অন্য ভাষা থেকে নেওয়া শব্দের প্রতিবর্ণীকৃত রূপ। যেমন ঃ আগস্ট ; ইশারা ; সুলতান ; পেনসিল ; খুশি ; চশমা ; মামলা ; জামা ; প্যান্ট ; অ্যাডভোকেট ; স্টেশন ; হুঁশিয়ার। লক্ষণীয়, হাসপাতাল, গেলাস প্রভৃতি শব্দ অন্য ভাষা থেকে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে, কিন্তু এগুলো প্রতিবর্ণীকরণের উদাহরণ নয়। 'হস্‌পিটাল' লেখা হলে তা হত প্রতিবর্ণীকরণ। মূল ইংরেজি শব্দ হস্‌পিটাল লোকের মুখের উচ্চারণে বদলে গেল এবং যা দাঁড়াল, তাকে বাংলা বর্ণে লিখতে গেলে হয় 'হাসপাতাল'। বস্তুত, এটি একটি বাংলা শব্দ যার মূল 'হসপিটাল'।